প্রথম

অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও হাত চলে যায় মাঝে মাঝে। আমার বাঁ–গালের কাটা দাগটায়। ওই দাগটা যার দেগে দেওয়া নন্তু নামের আমার সেই প্রথম বন্ধু আজ কোথায় জানি না। ১৯৫৭ সালে বাবার মৃত্যুতে অন্ডালের রেল কোয়ার্টার ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হয়েছিল। বিদায়বেলায় ছেড়ে আসা বাংলোর কাঠের গেটটার সামনে দীর্ঘক্ষণ হাত নাড়তে দেখেছিলাম নন্তুকে। তারপর ছয় দশক কেটে গিয়েছে। জানি না বিপুলা এই পৃথিবীর কোথায় আছে সে? আর তো আমাদের দেখা হয়নি। ১৯৫৭ সালে আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর। নন্তুরও ওইরকমই হবে। আমার বাবা ছিলেন রেলের পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। চাকরির সূত্রে তখন অন্ডালে পোস্টেড। পঞ্চাশের দশকে দামোদরের তীরে অন্ডাল ছিল নেহাৎই একটা ছোট্ট রেলশহর। তবে সাহেবদের হাতে গড়া বলে বেশ সুপরিকল্পিত, ছিমছাম। অন্তত আমাদের অফিসার্স কলোনি এলাকাটা। ছিল কাঠের স্লিপারের বেড়া দিয়ে ঘেরা খেলার মাঠ, চুনের দাগ কাটা টেনিস কোর্ট। প্রচুর দেবদারু, ঝাউ, নিম, কৃষ্ণচূড়া আর জিলিপি জঙ্গল গাছ ছিল রাস্তার ধারে ধারে।

বড় বড় গাছে ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ডওলা একটা একতলা বাংলোয় থাকতাম আমরা। সামনে টানা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যেত কিছুদূরেই অজগরের মতো অলস ভঙ্গিতে এলিয়ে থাকা রেললাইন। তার উপর দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে যেত কানাডিয়ান ইঞ্জিনে টানা মেল ট্রেন। তখন ছিল পাখা সিগন্যাল সিস্টেম। সন্ধ্যায় ও রাতে মুগ্ধ হয়ে দেখতাম সিগন্যালে লাল ও সবুজ আলোর ওঠাপড়া।

আমাদের ঠিক বাঁদিকের বাংলোটায় থাকতেন দে–বাবু বলে একজন। তিনি বদলি হয়ে যাওয়ায় ওই বাড়িতেই এসে উঠলেন সেনবাবু বলে নতুন একজন অফিসার। স্বামী–স্ত্রী এবং শান্তি ও নন্তু নামে তাঁদের দুই ছেলে। বড় ভাই শান্তি আমার থেকে তিন বছরের বড় মেজদার এবং ছোট ভাই নন্তু আমার বন্ধু হয়ে গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। পাশাপাশি দু'টো বাড়ির মধ্যে ব্যবধান বলতে পলকা একটা তারের জালের বেড়া। বাবা ও সেনকাকা অফিসে বেরিয়ে গেলেই আমাদের কাজ ছিল বেড়া টপকে এ বাড়ি–ও বাড়ি করা। নন্তুর মাকে কাকিমা বলতাম।

তা মেজদা ও শান্তির বেশ বড় একটা দল হয়ে গেল। ওদের খেলা ও যাবতীয় দস্যিপনার সঙ্গী ছিল পেটকা, বুচা, কৈলাস নামে কয়েকজন। সকলেই আশপাশের কোয়ার্টারের। ওরা গাছে চড়ত, ফুটবল পেটাত, চাকা চালাত – কিন্তু সে খেলায় আমাদের ঠাঁই হত না। কারণ আমরা নাকি 'দুধেভাতে' অর্থাৎ ওদের মতো 'বড়দের' সঙ্গে খেলার অযোগ্য। 'বড়দের' এই সামূহিক অবহেলাই জমাট করেছিল 'ব্রাত্য' দুই শিশুর বন্ধুত্বকে।

আমাদের প্রিয় খেলা ছিল প্রধানত দু'টো। (এক) আমাদের বাড়ির পিছনদিকে রান্নাঘরের প্রায় গায়ে ছিল একটা পেয়ারা গাছ। সময় পেলেই আমরা সেই গাছের তলার দিকের একটা ডাল ধরে বাঁদরের মতো ঝোলাঝুলি করতাম। (দুই) বাড়ির পিছনদিকেই কিচেন গার্ডেনে বাবা তৈরি করিয়েছিলেন বেশ বড় একটা চৌবাচ্চা। গরমের সময় গাছে জল দেওয়ার জন্য সেটা ব্যবহার করা হত। তা সেটাই হয়ে উঠেছিল আমাদের সুইমিং পুল। বিপুল উৎসাহে সেই জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতাম আমরা যতক্ষণ না মায়ের আদেশে আমাদের কাজের লোক গেনি মাসি জল থেকে তুলে নিয়ে যেত আমাদের।

একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘরের বাইরে খেলার উপায় নেই। অগত্যা বেড়া টপকে চলে গেলাম নন্তুদের বাড়িতে। যথারীতি ঘরের মধ্যে হুটোপাটি করছি দু'জনে। আমাদের দৌরাত্ম্য থামাতে কাকিমা বললেন, 'এই, তোরা চুপটি করে বোস। মালপোয়া বানাচ্ছি। হয়ে গেলেই গরম গরম দেব।' বসে পড়লাম কাকিমার পাশে। নিবিষ্ট হয়ে দেখছি মালপোয়া বানানো। কাকিমা ভাঁড়ার ঘর থেকে নিয়ে এলেন কড়া আর সিল করা একটা ডালডার কৌটো। একটা টিন কাটার দিয়ে নিপুণ হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেটে ফেললেন কৌটোর মাথাটা। গোল চাকতির মতো বেরিয়ে এল সেটা। উনুনের পাশে রাখলেন চকচকে গোল ওই টিনের চাকতিটা। কড়ায় ডালডাটা ঢালতে যাবেন তখনই ঘরের ভিতরে বেজে উঠল ফোন। কাকিমা ফোন ধরতে পাশের ঘরে যেতেই নন্তু খপ করে উনুনের পাশ থেকে তুলে নিল কেটে রাখা গোল টিনের ওই চাকতিটা। ছুরির মতো ধার তাতে। হাতে সেটা নিয়ে নাচতে নাচতে বলে উঠল, 'এটা আমার সুদর্শন চক্র, কাউকে দেব না এটা'।

সেই মুহূর্তে কী যে ভূত চাপল আমার মাথায়। মনে হল, ওই সুদর্শন চক্রটা তখনই হাতে না পেলে জীবন বৃথা। বায়না ধরলাম, 'এই নন্তু, দে না আমায় চক্রটা। আমিও একটু দেখি। দে না – আ – আ।'

'নিবি সুদর্শন চক্র? এই নে' – বলতে বলতে নন্তু এগিয়ে এসে সোজা সেই ধারালো টিনের চাকতিটা খপাত করে বসিয়ে দিল আমার গালে। নিমেষের মধ্যে রক্তগঙ্গা। আমার আর্ত চিৎকারে ঘর থেকে ছুটে এসেছেন কাকিমা। 'ও মা। এ কী কাণ্ড' বলে জড়িয়ে ধরেছেন আমাকে। নন্তুর সুদর্শন চক্র তখনও ঝুলছে আমার গালে। গড়ানো রক্তে ভিজে যাচ্ছে কাকিমার শাড়ির আঁচল। চক্রধারী নন্তু অবতার তখন খাটের নীচে লুকিয়ে পড়েছে।

অতঃপর তুলো–ব্যান্ডেজ–ডাক্তার। কাকিমা অফিসে ফোন করে ডেকে আনলেন সেন কাকাকে। তিনি এসে ছাতার বাঁট দিয়ে নন্তুকে এমন পেটালেন যে আমি আবার কেঁদে ফেললাম। কাকিমা লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলেন না। আমাকে কোলে করে মায়ের সামনে এনে হাজির করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। মা তখন কাকিমাকে বোঝাচ্ছেন, 'ছোটরা কি আর অতকিছু বোঝে? নন্তুকে আর বকাঝকা কোরো না।'

পরদিন সকালে গালে ব্যান্ডেজ লাগানো আমি পেয়ারাতলায় ঘুরঘুর করছি, হঠাৎ দেখি নন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে। করুণ স্বরে বলল, 'তুই কি আর কোনওদিনও খেলবি না আমার সঙ্গে? মা বলেছে, আমি একটা বাঁদর। বাড়িতে কেউ কথা বলছে না আমার সঙ্গে।'

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। নন্তু দেখি কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস তুলে দিল আমার হাতে। তারপর বলে উঠল, 'সুদর্শন চক্রটা তোর কাছেই রেখে দে।'

নন্তু দিলে কী হবে। তার সেই অমূল্য সম্পত্তি কবেই হারিয়ে ফেলেছি। তবে নন্তুরই দেওয়া একটা জিনিস গত ৬০ বছর ধরে গচ্ছিত আছে আমার কাছে। তারই এঁকে দেওয়া আমার গালের কাটা দাগটা। মৃত্যু পর্যন্ত ওটা আমার কাছেই থাকবে। আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের অটুট নিদর্শন।

কবিতা

ঘূর্ণিস্রোতের মতো ইচ্ছেগুলো তোকে ছুঁয়েই বেরিয়ে যায় কোন মায়ানগরীর দেশে

দিশা

অমলেন্দু বিশ্বাস

কুয়াশা ছিল না বলে মাঘের সকাল
ময়ূখ জড়ানো মুখ দেখাল আমাকে।

এখনও দেহাতি পথে হেঁটে যেতে দেখি
কলাবাগানের থেকে হাতে নিয়ে ফ্যাত্রা
ফিরছে যে কিশোরী তাকে কী চিনেছি।

বামদিকে কাঁচাঘর – সংলগ্ন চাতালে
ধানকে রোদ্দুরে ফেলে নাড়াচ্ছে বধূটি
অথচ কিশোরী দিশা পথ আগলে রেখে
চাঁদার প্রস্তাব রাখে আমার সকাশে।
সরস্বতী বানানের সঠিক বলাতে
ডানহাতে তুলে দিই শ্রীপঞ্চমী রাশি।

অতল চোখের ঘরে নেচে ওঠা রোদে
মঘাতারকার নীল প্রত্যয়ী প্রত্যুষে।

না–বলা কথা

শ্রীজা গুপ্ত

তোর কাছে পৌঁছানোর রাস্তাটা
আলোকবর্ষ দূরত্বে
তাই ঘূর্ণিস্রোতের মতো ইচ্ছেগুলো তোকে
ছুঁয়েই বেরিয়ে যায়
কোন মায়ানগরীর দেশে
যেখানে দমকা হাওয়ায় স্বপ্ন নাচে!
আমার না বলা কথাগুলো বৃষ্টি হয়ে
চলে যায় তোর আকাশে
তুই যখন দেখিস অঝোর বৃষ্টি
একমনে ...
আমার না বলা কথারাই কথা হয়ে
ঝরে পড়ে তোর জানলায়।

প্রতীক্ষায় আছি

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

এখন আমিও দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের
প্রতীক্ষায় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি
আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখি
পিছনে পড়ে রইল কী সব অরক্ষিত হয়ে

একসময় এ ভাবনারও শেষ হবে
অন্ধকারে প্রশান্ত গভীর নিদ্রার মাঝে
আমিও ভাবব আমার ফেলে আসা
সেই আলোক বাড়ির কথা, যেখানে
তুমি মালা গাঁথছ শব্দের পর শব্দ জুড়ে
নতুন নতুন সুরে গাইছ জীবনের জয়গান,

তুমিও তো কড়া নেড়েছিল আমার হৃদমাঝারে
জানি সেই শব্দের জন্য নিয়ত উৎকর্ণ হয়ে থাকার দিন
আজও অস্তমিত হয়ে যায়নি ...

পথচারী

অমিয় কুমার চৌধুরি

ডালে ডালে আতঙ্ক বাসা বাঁধেনি
নীচে শীতল ছায়া ধ্বংসদের মতো শান্ত।
ভাবনার গভীরে জন্মানো সাদা প্রশ্নাবলী
মরশুমি চাষের শেষ ফসল,
সস্তার রাস্তায় ওরা এখনও দাঁড়িয়ে
পর্দা সরে গেলে দু'পা এগোনো যায়।
ইচ্ছাপুরণের রঙিন পথচারী
সংঘর্ষ এড়িয়ে নির্ভেজাল ফ্যাকাসে।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক